সমকাল

তারিখ 29 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

সিন্ডিকেটের মুঠোয় যশোর শিক্ষা বোর্ড

■ সাব্বির নেওয়াজ ও তৌহিদুর রহমান

অনিয়ম-দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। সাধারণ শিক্ষকরা বলছেন, এ বোর্ডের কেনাকাটা কিংবা সেবা খাত– সবখানেই চলছে 'অর্থ-বাণিজ্য'। নিয়োগ, প্রতিষ্ঠান অনুমোদন, নিবন্ধন, একাডেমিক স্বীকৃতি, শাখা খোলা, পাঠদানের স্বীকৃতি, গভর্নিং বডির অনুমোদনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে অনিয়ম আর পক্ষপাতিত্ব করে বোর্ডের একটি সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরও কেউ কেউ প্রশ্ন প্রণেতা, মডারেটর আর প্রধান পরীক্ষক হচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানটি এখন আক্রান্ত ঘুষ বাণিজ্যে।

এ প্রসঙ্গে গত বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সোহরাব হোসাইন সমকালকে বলেন, 'এখন পর্যন্ত তাদের (মন্ত্রণালয়ের) কাছে এসব ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।' তিনি জানান, সুনির্দিষ্ট অনিয়মের অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে ছয়টি হাইস্পিড লেজার প্রিন্টার কেনার জন্য আহ্বান করা দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় যশোরের স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান 'মাল্টি কম্পিউটার ল্যান্ড' চলতি বছরের ২ জুলাই কার্যাদেশ পায়। কিন্তু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ওই প্রিন্টারগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করে আনতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি ২ আগস্ট কার্যাদেশের সময় বাড়ানোর জন্য বোর্ডের সচিব বরাবর আবেদন করে। মাল্টি কম্পিউটার ল্যান্ডের মালিক আতাউর রহমান অভিযোগ করেন, সময় বাড়ানোর এ আবেদন মঞ্জুর না করে শিক্ষা বোর্ডের সচিব মোল্লা আমীর হোসেন তার কাছে মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি করেন। তা না দেওয়ায় পরে টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে কার্যাদেশ বাতিল করা হয়। বিষয়টি নিয়ে নানা আইনি

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

সিন্ডিকেটের মুঠোয় যশোর শিক্ষা

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

দেনদরবারেও সুফল না পেয়ে আতাউর রহমান গত ১ ডিসেম্বর যশোরের স্পেশাল জজ আদালতে মামলা করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তার প্রতিষ্ঠানটিকে এখন বোর্ড কর্তৃপক্ষ কালো তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের সচিব মোল্লা আমীর হোসেন ঘুষ দাবির বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে জানান, মাল্টি কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান সময়মতো মালপত্র সরবরাহ না করে শেষ সময়ে সময় প্রার্থনা করে। এতে বোর্ডের অনেক ক্ষতি হওয়ায় নিয়মানুযায়ী তার কার্যাদেশ বাতিল করা হয়। তিনি আরও জানান, শিক্ষা বোর্ডকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করায় একটি মহল তার বিরুদ্ধে এ ধরনের মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ তুলছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যশোর শিক্ষা বোর্ডের অন্যান্য কার্যক্রম নিয়েও রয়েছে জোরালো আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ। ২০১২ সালে এ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে তিন হাজার ৩৫০ স্কুল-কলেজের সবক'টিতে অনলাইন কার্যক্রম চালু করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থী নিবন্ধন, ফরমপূরণ, ভুল সংশোধন, নোটিশ ও ফল প্রকাশ এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি মনিটর করা হয়। বোর্ড কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ২৫ লাখের বেশি টাকা আদায় করা যাবে না। অথচ বোর্ড কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে গত তিন বছরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আদায় করা হয়েছে দেড় কোটিরও বেশি টাকা।

বিদ্যালয়গুলোতে পাঠানো সর্বশেষ এসএসসি ফরম পূরণ সংক্রান্ত যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরিপত্রের (মাধ্য/পনি/৬৩/৮৪) ২-এর 'খ' নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে, আইসিটি খরচ বাবদ বোর্ডকে বিদ্যালয়প্রতি এক হাজার ও কলেজপ্রতি দেড় হাজার টাকা ফি দিতে হবে। গত তিন বছর ধরে একই হারে এ টাকা আদায় করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, এ খাতে দুই হাজার আটশ' বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা বোর্ডের এক বছরে আয় ২৮ লাখ টাকা ও তিন বছরে ৮৪ লাখ টাকা। আর ৫৫০ কলেজ থেকে বছরে আয় আট লাখ ২৫ হাজার টাকা ও তিন বছরের আয় ২৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। হিসাব অনুযায়ী, তিন বছরে বোর্ডের অধীনে ৩ হাজার ৩৫০ স্কুল-কলেজ থেকে এভাবে আদায় করা হয়েছে এক কোটি ৮৭ লাখ পাঁচ হাজার টাকা।

এ ব্যাপারে বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মজিদ জানান, বোর্ড কমিটির এমন সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানা নেই তার। তা ছাড়া কতদিন এ খাত থেকে টাকা নেওয়া হবে এবং আদায় করা অতিরিক্ত টাকা কীভাবে কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেটাও তার অজানা।

১০ বছর আগে যশোর শিক্ষা বোর্ডের নতুন ছয় তলা ভবনে ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে লিফট স্থাপন করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, ওই ১০ বছরে লিফটের সংস্কার ব্যয় দেখানো হয়েছে আরও ১৫ লাখেরও বেশি টাকা। এদিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, স্থানীয়ভাবে লিফট সংস্কারের কোনো সুযোগ নেই। এ জন্য ঢাকা থেকে লোকবল ও ইকুইপমেন্ট আনতে হয়। সে কারণে 'যৌক্তিকভাবেই' লিফট মেরামত ব্যয় বেড়েছে।

ঘুষ বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় অভিযোগ রয়েছে বোর্ডের বিদ্যালয় ও কলেজ অনুমোদন বিভাগকে ঘিরে। খুলনা বিভাগের ১০ জেলার উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকরা নানা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বোর্ডের কলেজ ও বিদ্যালয় অনুমোদন বিভাগে আসেন। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে ম্যানেজিং কমিটি, বিভাগ, শাখা, বিষয় ও স্বীকৃতি অনুমোদন, নবায়ন এবং পাঠদানের অনুমতি ইত্যাদি। শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, দুই-একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া বোর্ডকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটকে ঘুষ না দিয়ে ওই দুই বিভাগে কোনো ফাইলই আলোর মুখ দেখে না। তাদের অভিযোগ– কলেজ-স্কুলের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ, কম্পিউটার, কৃষি শিক্ষা, শ্রেণী, শাখার অনুমোদন, পাঠদানের অনুমতি এবং অস্থায়ী স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ নিয়ে ওইসব বিষয়ের অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।

নিয়মানুযায়ী কোনো কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, লাইব্রেরি, প্রতিষ্ঠানের নিজ নামে নিজস্ব জমি ও অন্যান্য সরকারি শর্ত পূরণ করতে হয়। তবে অভিযোগ রয়েছে, এসব শর্ত পূরণ না করলেও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার মোখলেস আনোয়ার কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যার মেমো নং-৭৭০। একইভাবে অবৈধ পন্থায় খুলনা জেলার সদর উপজেলার আই আই কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। যার মেমো নং-৬৭৬। তৎকালীন উপ-কলেজ পরিদর্শক জিল্লুর রহমান একাডেমিক স্বীকৃতি অনুমোদনের ফাইলটির নোটে 'শর্ত পূরণ হয়নি' লিখলেও সেকশন অফিসারের মাধ্যমে এ নোট পরিবর্তন ও উপ-কলেজ পরিদর্শকের মতামত উপেক্ষা করে ফাইলটি অনুমোদন করা হয়। এ ছাড়া সরকারি শর্ত উপেক্ষা করে খুলনার জে কে এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কলেজিয়েট করার অনুমোদন, ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার আবদুল হাই কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি পরিবর্তনের অনুমোদন, যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার রায়পুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান শাখা খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়। যার স্মারক নং : ক/অ/৮৯৩(৬)৪, তারিখ-০৩-১২-২০১২। তবে কলেজ পরিদর্শক অমল কুমার বিশ্বাস সমকালকে বলেন, 'নিয়মের বাইরে কোনো কিছুই করা হয়নি।'

অনিয়মের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই এ বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শন শাখাও। বোর্ডের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি সরকার নির্ধারিত নীতিমালার ছকে নতুন বিদ্যালয় অনুমোদন ও কয়েকটি স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীর অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত বিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ের দূরত্ব বেশি দেখিয়ে মিথ্যা তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে মোটা অঙ্কের ঘুষ। গত ছয় মাসে এ বিভাগের কর্মকর্তারা ১৮০টি স্কুল পরিদর্শন করেছেন। তবে অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষা বোর্ডে পর্যাপ্ত গাড়ি থাকার পরও পরিদর্শনের সময় গাড়ির ব্যয় মেটাতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকেই। এভাবেও পকেট ভারী করেছেন বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মকর্তা।